বিন্দু বিন্দু

আতরবালার সীমান্তগাথা আর সিমার ঃ

ব্লাইণ্ড অপেরার আতরবালার সীমান্তগাঁথা আমি দেখতে গিয়েছিলাম কয়েকজন বান্ধবী নিয়ে। বান্ধবীদের সকলে চোখের জল মুছেছে নাটক দেখতে দেখতে। চোখে আমারও জল ছিল। নাটকের আগে ভেবেছিলাম, রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করার বদলে যে অন্ধ ছেলেমেয়েরা নাটক করছে তা দেখেই আমি মুগ্ধ হয়ে যাবো। ওরা যা কিছুই করুক, যেহেতু ওরা অন্ধ, ভেবেছিলাম, করুণা হবে। ভেবেছিলাম, অন্ধজনে দেহ আলো জাতীয় কোনও কাতর আহবান ওরা জানাবে নাটকের মধ্য দিয়ে। কিন্তু আমাকে আমূল মিথ্যে প্রমাণ করে ওরা এমন নাটক করলো যে নাটক যে কোনও বড় নাট্যগোষ্ঠীর নাটকের চেয়ে উন্নতমানের। বেশ অনেক নাটকই তো দেখা হয়েছে, আমাকে এত গভীর করে স্পর্শ করেনি অন্য কোনও নাটক। আমার কণ্ঠ আঁকড়ে ছিল কষ্টের কাঁকড়। আতরবালা তখন আর মঞ্চে নয়, আতরবালা তখন আমি, আমার বান্ধবী, আতরবালা তখন জগতের সকল নারী।

মানুষ অন্ধ বলেই আতরবালাদের কষ্ট চোখে পড়ে না। আতরবালা তাদের কাছে কেবলই একখণ্ড মাংসপিণ্ড।

আতরবালার সীমান্তগাথার পর আরও একটি বিস্ময় আমার জন্য অপেক্ষা করেছিল, সিমার নামের বিস্ময়। খুব ছোট একটি নাটকের দল *অর্ঘ* থেকে মনীশ মিত্র পরিচালনা করেছেন নতুন এই নাটক সিমার। সুজাতা সদনে সেদিন যখন মঞ্চস্থ হচ্ছে এটি, হাতে গোনা কিছু দর্শক শুধু। আগে মনীশ মিত্রের রায়ট নাটকটি দেখেছিলাম, ভালো লাগেনি। সিমার দেখতে বসে খুব যে কিছু আশা করেছিলাম, তা নয়। কিন্তু আমাকে স্তম্ভিত করলো এই নাটক। কাঁদালো এই নাটক। নারীর ওপর ধর্মের আর পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নির্মম নির্যাতন বড়

নগ্ন করে দেখানো হয়েছে। এভাবেই তো খুলে মেলে দেখাতে হয় ক্ষত, নইলে অসুখ সারবে কেন! এভাবেই তো চিৎকার করে কাঁদতে হয়, নইলে বুকের জ্বালা কমবে কেন!

পুরো নাটকটি একটি কবিতা। কবিতা কিন্তু সে কবিতা যন্ত্রণা দেয়, সে কবিতা সত্য বলে, সে কবিতা মুখোশ খুলে বের করে আনে বিভৎস মুখ।

পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি মেয়েকেই আমি আতরবালার সীমান্তগাথা আর সিমার এই দুটো নাটক দেখার অনুরোধ করছি। করছি এই কারণে যে, অনেক মেয়েই ভুলে যায় যে তারা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নিকৃষ্টতম শিকার, তারা দাসি বাঁদী অন্ধ বধির বস্তু। ভুলে যায় যে ঘুম ঘুম আমেজ কাটিয়ে তাদের জেগে উঠতে হবে, তাদের পিঠে যে অদৃশ্য চাবুক পড়ছে, সে চাবুক যার হাতেই থাকুক, কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলতে হবে, ছুড়ে ফেলতে হবে। ভুলে যায় যে এ ছাড়া তাদের আর কোনও উপায় নেই। উপায় নেই, যদি তারা মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার অধিকার পেতে চায়।

নান্দীকার এবং রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত ঃ

নান্দীকারের নাটক আগে দেখার সৌভাগ্য হয়নি আমার। এবার কিছু নাটক দেখে আমি সাংঘাতিক অভিভূত। বড়দার গৌতম হালদার আমাকে হাসিয়ে কাঁদিয়ে একাকার করেছেন। সোজন বাদিয়ার ঘাট আমাকে বাকরুদ্ধ বসিয়ে রেখেছে। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এমন শক্তিশালী নাটক আগে আমার দেখা হয়নি। পৃথিবীর অনেক দেশের অনেক বিখ্যাত নাটক দেখার অভিজ্ঞতা থেকে আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি, নান্দীকারের নাটকের পাশে দাঁড়াবার যোগ্যতা পশ্চিমেরও খুব কম নাটকের আছে।

নাটকের যে মানুষটির সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমি ধন্য, তিনি রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। অসাধারণ মানুষ। মধুসুদন মঞ্চে সুনামী বিধ্বস্ত মানুষের জন্য ত্রাণ চাইতে গিয়ে তিনি ধনী দেশের আরও ধনী হওয়ার ষড়যন্ত্রের কথা, বিশ্বায়নের কুটিল রাজনীতি আর তৃতীয় বিশ্বের বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষের কষ্টের কথা,

মানবতার কথা এমন করে বললেন যে চোখে জল এসেছিল আমার। কলকাতায় আজকাল এমন মানববাদী খুব মেলে না। সত্যিকার মানুষের বড় আকাল এখন।

সাঁঝবেলাঃ

স্বাতীলেখা আমাকে বলেছিলেন পারলে যেন সাঁঝবেলা নাটকটি দেখি। দেখেছি নাটকটি। স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত আর মেঘনাদ ভট্টাচার্যের অসাধারণ অভিনয় বাদ দিলে নাটকটির সম্পদ বলতে নাটকের বক্তব্য। এই রক্ষণশীল সমাজের জন্য বক্তব্যটি সম্ভবত বলিষ্ঠ। যে জঘন্য পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীকে পুরুষের সম্পত্তি বলে মনে করা হয়, নারীকে ভোগ্যবস্তু আর সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, সতীত্ব বজায় রেখে সন্তান সন্ততিদের সুষ্ঠুভাবে লালন পালন করে যে সমাজে একজন নারীকে *ভালো নারী* হতে হয়, নারী যদি ছিঁড়তে চায় সেই সমাজের সেই পুরুষতন্ত্রের শিকল, কত আর পারে সে ছিঁড়তে। একজন নারীর জীবন যে কেবল সন্তানের সেবায় উৎসর্গ করার জন্য নয়, বয়স হলেও নারীরও যে পুরুষ-বন্ধু থাকতে পারে, সে বন্ধুও যে কিছুদিন বন্ধুর বাড়িতে এসে কাটিয়ে যেতে পারে, নারীর নিজের জীবনটি যে তার নিজের, এই জীবনটির সুখ দুঃখ অন্য কারও সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ারও যে তার অধিকার আছে, এটিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পুরো নাটকটিতে বিস্তর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু মানুষ হিসেবে নারীকে বিচার করলে এই বক্তব্যটিই আরও বেশি বলিষ্ঠ হতে পারতো। নারীর স্বাধীনতা এবং অধিকারের কথা বলা হলেও নাটকে খুব কম স্বাধীনতা *ভিক্ষে* চাওয়া হয়েছে, ভয়ে ভয়ে দুএকটি অধিকারের কথা বলা হয়েছে মাত্র। বলা হলেও সেই অধিকারগুলো প্রয়োগ করায় দেখেছি বিষম আপত্তি। নায়ককে দৃশ্য থেকে সরে গিয়ে বোঝাতে হয়েছে, প্রেমিক নিয়ে শেষ পর্যন্ত মধ্যবয়স্ক মহিলাটি লিভ টুগেদার করছে না। দর্শক, মেঘনাদ বলেছেন, নাটক দেখে এখন বড় নিশ্চিন্তে বাড়ি যেতে পারছে। যদি দেখানো হতো যে, নারীটি যে ব্যবস্থাটির পক্ষে পুরো নাটক জুড়ে কথা বলেছে, সে ব্যবস্থাটি নিজের জীবনে খাটিয়েছে, সংসারে সে স্ত্রী হোক, মা হোক, মাসি হোক, পিসি হোক, মূলত সে মানুষ, তার নিজের জীবনটি কেবল তারই, সেই জীবন নিয়ে সে যা খুশি করতে পারে, তার যা করতে ইচ্ছে করেছে তাই সে করেছে, নিজেকে সে সুখ দিয়েছে --- তবে বিষম অস্বস্তি হবে দর্শকদের। নাটকের বক্তব্য, যদি সে

নারীর অধিকারের প্রশ্নে হয়, সিকি নয়, আধা নয়, পূর্ণ অধিকারই নারীর প্রয়োজন, দর্শকরা এ কথা মনে নিলেও মেনে নিতে পারে না। নারী যদি নিজের অধিকারের কথা উচ্চকণ্ঠে বলে, তবে তা দেখতে শুনতে কারওরই হয়তো মন্দ লাগে না। কিন্তু নারী যদি অধিকারপূর্ণ জীবনটি রীতিমত যাপন করতে বসে, তবেই মুশকিল।

মেঘনাদ ভট্টাচার্যকে বলেছি, দর্শকদের অস্বস্তি যদি হয়, হোক। তাদের সুখ শান্তির দিকে অত নজর রাখলে কি কোনও নিয়ম ভাঙা যায় সত্যিকারের! নিয়ম, বিশেষ করে সে যদি নারীর ওপর পুরুষতন্ত্রের কঠোর কঠিন নিয়ম হয়!

নাথবতী অনাথবতঃ

বহু বছর আগে শাঁওলির নাথবতী অনাথবত শুনেছিলাম ক্যাসেটে। এবার মঞ্চে দেখা হল। শাঁওলির অভিনয় দেখে কথা বলার কোনও কথা থাকে না। বিস্ময় আর মুগ্ধতা গ্রাস করে রাখে সর্বাঙ্গ। নারী বেরিয়ে আসে ছিঁড়ে ফুঁড়ে, নারী উন্মোচন করে বড় বড় পুরুষ-চরিত্রের চিরায়ত চেহারা। নারী এখানে দ্রৌপদি। দ্রৌপদির উপলব্ধি কেবল দ্রৌপদির নয়। দ্রৌপদির যে যন্ত্রণা সে যন্ত্রণায় ভোগে সকল নারীই। কিন্তু অধিকাংশ নারীই মাথা পেতে মেনে নেয় পুরুষের একশ রকম নির্যাতন। দ্রৌপদি মেনে নেয়নি, নিজের যন্ত্রণার কথা বলতে গিয়ে পাণ্ডবদের পাষণ্ডতার কথা কিছু গোপন রাখেনি সে। নাটকটি দেখতে দেখতে আমি নিজেও শক্তি পাচ্ছিলাম নিজের ভিতর, পুরুষের প্রখর পৌরুষের খপ্পরে পড়ে পুরোপুরি থেতলে যাওয়া থেকে নিজেকে যে করেই হোক মুক্ত করার শক্তি। হঠাৎ শেষ দিকে আমাকে নিঃশক্তি করে, নিঃস্ব করে দ্রৌপদি-শাঁওলি নিজেকে সমর্পণ করে ভীমের কাছে। এতকাল পর সে বুঝতে পেরেছে ভীম নাকি তাকে ভালোবাসে। সাহসী শক্তিমান দ্রৌপদি মুহূর্তে বিচ্ছিরিরকম দুর্বল হয়ে গেল, বড় বেশি নির্বোধ হয়ে গেল। খুব মায়া হচ্ছিল তখন হোঁচট খেয়ে পড়া মেয়েটির জন্য। দ্রৌপদি কি ভীমের কোনও ত্রুটিই পেল না? খুঁজলে কিন্তু ঠিকই পেতো। খোঁজেনি। পুরুষকে শেষ পর্যন্ত আশ্রয়ই মনে করেছে, অনেকটা পথ সামনে এগিয়ে এসে নারী আবারও পিছন ফিরে তাকালো, ভালোবাসার ফাঁদে পা দেবার জন্য, পরাধীন হওয়ার জন্য, পতিব্রতা হওয়ার জন্য তার সে

কী আকুতি। ছি দ্রৌপদি ছি, এই ভুলটি কেন তুই করতে গেলি। কোনও পুরুষ তোকে সত্যিকার ভালোবাসে না, তুই তো নারী, তুই তো নিচু, তুই তো নরক, নরকের দ্বার, কামড়াকামড়ি করে তোর সুগন্ধী শরীরটা কেবল খেতে চায়, শরীর ফুরোলো তো তুই ফুরোলি, এত বুঝিস এটি কেন বুঝলি নারে! তোকে দুর্বল ভেবে ভীম হয়তো তোকে করুণা করেছে, এই করুণাকে ভালোবাসা বলে ভুল করা উচিত হয়নি তোর। মাথা উঁচু করে শিরদাঁড়া শক্ত করে এবার একটু একা দাঁড়িয়ে যা না দ্রৌপদি, দাঁড়াতে দে পুরুষতন্ত্রের যাঁতাকলে পিষ্ট হতে থাকা লক্ষ কোটি নারীকে।

সোনাগাছিঃ

দুর্বারের সদস্যরা আমাকে ঘুরিয়ে দেখালো পুরো সোনাগাছি। এ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা আমার। এই প্রথম কোনও নিষিদ্ধ পল্লীতে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম। কলকাতার যে জগতটিকে আমি চিনি, সেই জগতের পেটের ভিতরেই লুকিয়ে ছিল আরেক জগত, সে জগতটির কথা কেবল শুনেছিলাম, এবার দেখা হলো নিজের চোখে দেখে এলাম সেই জগত, পুরুষতন্ত্রের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর কুৎসিত রূপ, দেখে এলাম মাংসের হাট। নারীকে পণ্য বানাবার নিয়মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আমি দেখে এলাম ঝাঁক ঝাঁক নারী-পণ্য। দুর্বার নামের সংগঠনটির কাজকর্ম, যা আমাকে অনেকটা সময় নিয়ে শোনালেন মৃণাল দত্ত, অত্যন্ত প্রশংসা পাবার দাবি রাখে। ১.যৌনকর্মীদের ছেলেমেয়েদের হোমে পাঠানো হচ্ছে, ওখানে লেখাপড়া করছে ওরা, অন্য পেশা যদি বেছে নিতে চায় নিতে পারে। ২. যৌনকর্মীদের ওপর পুলিশ, মালকিন, বাবুদের যে অন্যায় অত্যাচার হতো, টাকা পয়সা কেড়ে নেওয়া হতো, সেগুলো দমন করছে দুর্বার। ৩. এইডস রোগ কারওর আছে কি না পরীক্ষা হচ্ছে, যেন না হয় রোগ, তার ব্যবস্থা হচ্ছে। ৪. আঠারো বছরের কম বয়সী মেয়েদের উদ্ধার করা হচ্ছে। ৫. প্রতারকরা যখন বিক্রি করতে আসে মেয়েদের, তাদের থেকে মেয়ে যেন না কেনা হয়, সেই ব্যবস্থা দূর্বার করছে। ৬. মেয়েদের টাকা পয়সা ঠগরা মেরে দিত এতকাল, এখন তাদের জন্য ব্যাংক খোলা হয়েছে। ---সুব্যবস্থার শেষ নেই। মৃণালকান্তি প্রচুর যুক্তি দেখালেন যে শ্রমিকের স্বীকৃতি পেলে যৌনকর্মীদের

ভোগান্তি দূর হবে, দূর হবে এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। বিশ্বাস করি না, দুর্বারের স্লোগানটিও --- *যৌনকর্মকে শ্রদ্ধা করতে হবে।* আমি যৌনকর্মীকে মানুষকে হিসেবে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু যৌনকর্মকে, যে যৌনকর্মে ভালোবাসার সম্পর্ক নেই, আছে টাকাপয়সার সম্পর্ক, শ্রদ্ধা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। দুর্বারের অনেক সদস্যই যৌনকর্মী, স্বপ্না তার মধ্যে একজন। প্রচণ্ড সাহসী মেয়ে। বুদ্ধিমতী। স্বপ্না যখন সবল কণ্ঠে বলে যে *সংসারে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কও তো টাকা পয়সার সম্পর্ক,* আমি অস্বীকার করতে পারি না। ১. *অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েরা এখানে অবৈধভাবে ব্যবসা করছে, ২. প্রতারকরা মেয়ে ধরে ধরে বিক্রি করে দিয়ে যায় এ পাড়ায়, ৩. মেয়েদের মারধর করছে খদ্দেররা।* এসব অভিযোগ শুনে স্বপ্না বলে, *সমাজেও তো বাল্যবিবাহ আকছার হচ্ছে, জোর করে বিয়েও দেওয়া হচ্ছে মেয়েদের, স্বামীরা স্ত্রীদের পেটাচ্ছে, মারছে, ধর্ষণ করছে।* না, আমি অস্বীকার করতে পারি না এসব। হচ্ছে, তা ঠিক। কিন্তু এক জায়গায় মন্দ হচ্ছে বলে অন্য জায়গায় মন্দ হওয়াকে মেনে নেওয়ার কোনও যুক্তিও আমি দেখি না। সব মন্দের বিরুদ্ধে, সব নির্যাতনের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ করতে হবে। দুর্বারের ওপর ভরসা করে সোনাগাছির মেয়েরা এখন পায়ের তলায় মাটি পাচ্ছে। কিন্তু সে মাটিতে, চাই না কোনও শিকড় গেড়ে যাক কারওর। পশ্চিমবঙ্গের আটষট্টি হাজার যৌনকর্মীর পুনর্বাসন যেহেতু এই মুহূর্তে সম্ভব নয়, মেয়েরা যেন অন্তত অত্যাচারিত না হয় আর, সেটিই , যদি মানুষ হই এতটুকু, দেখতে হবে।

ভদ্রপাড়া য় এমন সৎ এমন সাহসী এমন নির্ভীক, এমন বেপরোয়া, এমন সচেতন মেয়ে আমি দেখিনি। আমাকে ঘিরে ছিল সুতপা, স্বপ্না, শর্মিলা, বীনা, রীনা। আমারই বোনের মতো। আমারই বান্ধবীর মতো। দারিদ্র আর পুরুষের প্রতারণাও আমাকে সোনাগাছির গলিতে এনে ফেলতে পারতো। আমার কাছে একাকার হয়ে যায় *ভদ্র এবং অভদ্র পাড়ার মেয়ে,* একাকার হয়ে যায় *পতিতা - অপতিতা, ভালো মেয়ে মন্দ মেয়ে, যৌনকর্মী- অযৌনকর্মী* সব। আমরা মেয়ে। আমরা নারী। আমাদের এই একটিই পরিচয়। আমরা নির্যাতিত। কেউ এ পাড়ায় নির্যাতিত, কেউ ও পাড়ায়। আমাদের এই একটিই সত্য।

বাংলাদেশের মেয়ে রেখার কাছে জানতে চাইলাম আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ আছে কি না তার। *না,* বলল সে। এখান থেকে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে

করে কি না, প্রশ্ন করলে রেখা বলল, *খানকিখাতায় নাম লিখিয়েছি দিদি, এখন কি আর বেরোনো সম্ভব!*

দুর্বার কি বেরোনোর পথ দেখায় খুব? আমার মনে হয় না। দুর্বার কিন্তু মেয়েদের খুব গৌরব করে বলতে শেখাচ্ছে, *আমি যৌনকর্মী, যৌনকর্মের ব্যবসা আমার ভালো লাগে।* সমস্বরে সকলকে বলতে শিখিয়েছে, *আমরা শ্রমিকের অধিকার চাই। অন্য যে কোনও শ্রমিকের মতো আমরাও শ্রমিক। যে কোনও শ্রমের মতো এই শ্রমকেও শ্রদ্ধা করতে হবে।*

দুর্বার যদি এমনই শ্রদ্ধা করতে শেখায় এই পেশাটিকে, তবে এই পেশা ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন কি করে দেখাবে মেয়েদের, আশা কি করে দেবে! বেরিয়ে যাওয়ার পথ বাতলাবে কি করে! দুর্বার থেকে এমনও বলা হয় যে *এই পেশা পৃথিবীর আদিতম পেশা, এই পেশা ছিল, আছে, থাকবে।* আমি মানি না এ কথা। অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হলে, নারী পুরুষের অধিকার সমান হলে, নারী শিক্ষিত হলে, স্বনির্ভর হলে, আত্মমর্যাদা এবং সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার অর্জন করলে বেশ্যাবৃত্তি উঠে যাবে, যেতে বাধ্য।

দুর্বারের নানা রকম যুক্তি আছে বেশ্যাবৃত্তিকে টিকিয়ে রাখার। এরই একজন *বিচক্ষণ* সদস্যকে যখন আমি বলছিলাম *মেয়েরা তো কেউ চায় না শরীর বিক্রি করতে, যদি সে বেরিয়ে যেতে চায় এই অসম্ভব অসম্মানের জীবন থেকে, তবে!*

মেয়েদের শেখানো হচ্ছে নানা রকম হাতের কাজ, ছোটখাটো শিল্পকলা।

বেশ, ভালো।

ভালো, কিন্তু মেয়েদের নাচ গান শেখানোর দাবি যখন করতে চাইছে দুর্বার, আমি আপত্তি করলাম। *শরীর বিলিয়ে পুরুষকে আনন্দ দেওয়া হচ্ছে এবার নাচ দেখিয়ে গান শুনিয়ে বুঝি পুরুষকে আরও আনন্দ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে!*

দুর্বারের সেই সদস্য বললেন, *এখানে বিহারি শ্রমিকরা থাকে, ওরা একা থাকে। বউ থাকে বিহারে। ওদের কষ্টের কথা একটু ভাবুন। ওদের তো মেয়ে দরকার।*

আমি বললাম, *হস্তমৈথুন করার উপদেশ দিতে পারেন তো।*

শুনে এমনভাবে হাসলেন তিনি, যেন এরকম অদ্ভুতুড়ে কথা জীবনে শোনেননি।

বললাম, *বলুন তো, মেয়েদেরই কেন বেশ্যা বানানো হয়!*

তিনি বাঁকা হাসি হেসে বললেন, *পুরুষরাও তো আছে এই ব্যবসায়।*

আমি হেসে বলি, *সে তো আছে পুরুষের জন্যই। সমকামী পুরুষের জন্য।*

ভদ্রলোক আবারও আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, অসহায় সেই পুরুষদের কথা, যে পুরুষেরা *একা* থাকে, সেইসব পুরুষের যৌনপিপাসার কথা, তাদের তীব্র যন্ত্রণার কথা, তীব্র কষ্টের কথা, যৌনসঙ্গমের সুখ মেটাতে যাদের হাতের কাছে স্ত্রী বলে জিনিসটি নেই। কেন আমার সেই পুরুষের কষ্টের কথা ভেবে কষ্ট হয় না, কেন আমি তাদের করুণা করতে চাইছি না দেখে তিনি অবাক হলেন।

আমার মুখে তখন তেতো হাসি। হাসিটি থাকে যখন বলি, বেশ কড়া স্বরেই বলি, *মশাই, যে সব মেয়ে একা থাকে, যে মেয়েদের স্বামী থাকে প্রবাসে, যে মেয়েদের স্বামী উত্থানরহিত, ধ্বজভঙ্গ তাদের কষ্টের কথা ভেবেছেন কখনও? কেবল পুরুষের যন্ত্রণাই বুঝি চোখে পড়ে। তা হবে না কেন! পুরুষতন্ত্রের এই কুৎসিত অমানবিক ব্যবস্থাটি টিকিয়ে রাখতে চাইছেন তো পুরুষের আরামের জন্যই।*

অনেকেই, অনেক বুদ্ধিজীবীও যুক্তি দেখিয়েছেন যৌনকর্মীদের পক্ষে। ভিক্ষাবৃত্তির চেয়ে এই বৃত্তি ভালো। *ভদ্রপাড়ায়* মেয়েদের যৌনহেনস্থার শিকার হতে হচ্ছে। তবে *অভদ্রপাড়ায়* হলে চোখ এত টাঁটায় কেন। ভদ্রপাড়া কী এমন ভদ্র অভদ্রপাড়ার চেয়ে!

পুনর্বাসন নিয়ে. আগেই বলেছি, যে, দুর্বারের সদস্যদের খুব আবেগ নেই। পুনর্বাসনে লাভ হয়নি আগে। লোকের থুতু খেয়ে মেয়েদের আবার পল্লীতে ফিরে আসতে হয়েছে। যে মেয়েরা মুক্তি পেতে চায়, লোকের ঘরবাড়িতে কাজ করতে গেলে সেই মেয়েদের গৃহকর্তা দ্বারা ধর্ষিতা হতে হয়। যৌনকর্ম যখন হচ্ছেই তবে বিনে পয়সায় না হয়ে পয়সার বিনিময়ে হলেই তো ভালো --- এই হল ধর্ষিতা মেয়েদের যুক্তি।

যুক্তি ভালো। কিন্তু মুক্তি কিসে হবে মেয়েদের? সোনাগাছি, কাঁকুড়গাছি -- সব গাছিতেই তো মেয়েরা বন্দী।

রঞ্জনঃ

হঠাৎ একদিন শুনি রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে। শুনি আনন্দ পাবলিশার্সের বাদল বসুর কাছে। বাদল বসু শুনেছেন তাঁর কন্যার কাছে। কন্যা এই গুজবটি শুনে এসেছে তার কলেজ থেকে। তারপর তো শহরময় শিল্প সাহিত্যের সঙ্গে জড়িত থাকা মানুষের মুখে শুনেই যাচ্ছি বিয়ের গল্প। গুজবের উৎস খুঁজে পেতে দিন কয়েক আমি চেষ্টা করেছিলাম। ব্যর্থ হয়ে ক্ষ্যান্ত দিয়েছি। রঞ্জনকে বলেছি, *আপনার সঙ্গে বন্ধুত্বের বাইরে সামান্যও প্রেম প্রেম জাতীয় কিছু একটা যদি চলতো আমার, তবে না হয় গুজবের একটা অন্তত অর্থ থাকতো।* গুজব যারা ছড়িয়েছে আর গুজব যারা বিশ্বাস করেছে তারা যে আমার লেখা কেউ পড়ে না সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। বিয়ে ব্যাপারটিতে আমি বিশ্বাসী নই, এ কথা অযতনিযুতবার আমার বলা হয়ে গেছে, এখন আর নতুন করে বলার প্রয়োজন মনে করছি না। রঞ্জনের সঙ্গে পরিচয়ের পর বহুকাল আমার সঙ্গে কোনও যোগাযোগ ছিল না। বন্ধুত্বটা নতুন হয়েছে। কলকাতায় রঞ্জনের মতো আপাদমস্তক এমন সজ্জন ভদ্রলোক আমি খুব কম দেখেছি। রঞ্জন যা কিছুই লিখুন, লেখেন তিনি লিখতে হয় বলেই হয়তো, লেখা পড়ে মনে হতে পারে, মেয়েদের তিনি যৌনসামগ্রী ছাড়া আর কিছু মনে করছেন না, কিন্তু মেয়েদের তিনি, যতদূর দেখেছি, সত্যিকার শ্রদ্ধা করেন এবং সত্যিকার সম্মান করেন। কলকাতার পুরুষদের মধ্যে এই চরিত্রটি বড় দুস্প্রাপ্য। রঞ্জন যদি নারীকে সামান্যও অশ্রদ্ধা করতেন, ভোগ্যবস্তু বলে সামান্যও মনে করতেন, যদি নারী পুরুষের সমানাধিকারে তাঁর বিশ্বাস না থাকতো, তবে রঞ্জন আমার বন্ধু হতে পারতো না।

আমি রূপবান পুরুষদের পছন্দ করি খুব, রঞ্জনের রূপ নেই, রূপ না থাকলেও অগুণতি গুণ আছে তাঁর, আছে বলেই রঞ্জন আমার খুব প্রিয় মানুষ, প্রিয় বন্ধু। রঞ্জনের মুখের এবং লেখার ভাষার আমি মুগ্ধ শ্রোতা এবং পাঠক।

বইমেলাঃ

বইমেলা শেষ হচ্ছে। কেমন খালি খালি লাগছে সব। অনেক বন্ধুর সঙ্গে এখন আর আগের মতো দেখা হবে না, যেমন হতো বইমেলায়। বইমেলা শেষ হলো যেন নিজের প্রাণটি কোনও ঝাড় জঙ্গলে ঘুমোতে গেল। বড় নিঃস্ব নিঃস্ব

লাগছে। ইচ্ছে করে বইমেলাকে আরও দীর্ঘ সময়ের জন্য ধরে রাখি। সত্যি বলছি, এই একবিন্দু বইমেলায় আমার তৃষ্ণা মেটে না।